

কর্মক্ষেত্রে নারীর মানসিক স্বাস্থ্য: চ্যালেঞ্জ, সংকট ও উত্তরণের পথ

সেলিনা আক্তার

অরিন দীর্ঘদিন ধরে একটি বহুজাত কোম্পানিতে কাজ করছেন, যিনি তার কাজের দক্ষতার জন্য সবার কাছেই পরিচিত। কিন্তু সম্প্রতি তিনি মা হওয়ায় কাজে ঠিকভাবে মন দিতে পারছেন না। তার অফিসে প্রায়ই দেরি হচ্ছে, মাঝে মাঝে তিনি অফিসে ঘুমিয়ে যাচ্ছেন এবং মেজাজও আগের থেকে খিটিমিটে হয়ে গেছে। অনেকে ব্যাপারটা নিয়ে তাকে তার কাজের দক্ষতার বিষয়ে কথা বলছেন। এতে অরিন আরও বেশি করে নিজের মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন। এর ফলে তিনি দিনদিন মনমরা হয়ে যাচ্ছেন, ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না তার, কোনো কাজে আগের মতো আর আগ্রহ পাচ্ছেন না।

নারী হোক সে কর্মজীবী অথবা গৃহিণী দুই জায়গায়ই মানসিক স্বাস্থ্য এখনো অবহেলিত, অপ্রকাশিত এবং অনিশ্চিত। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মানসিক সমস্যা আক্রান্ত হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। নারীদের মধ্যে বিষণ্ণতা (Depression) এবং উদ্বেগজনিত (Anxiety) সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ২১.৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ১৫.৭শতাংশ। নারীদের মধ্যে সাধারণ মানসিক সমস্যাগুলোর হার প্রায় ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। নারীদের বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হওয়ার হার পুরুষদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এখনো বিশ্বের অনেক দেশে পুরুষদের থেকে নারীরা মানসিক রোগে বেশি ভুগে থাকেন।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। নারীরা অনেক সময় পুরুষদের সমান দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও উপেক্ষিত হন। একই পদের জন্য নারী কর্মীদের কম বেতন দেওয়া হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও নারীদের পিছিয়ে রাখা হয়। কিছু প্রতিষ্ঠান আজও মনে করে, নেতৃত্বে পুরুষই বেশি উপযুক্ত। এ ধরনের বৈষম্য কর্মীদের মনোবলে আঘাত করে। এতে নারীরা নিজেকে অবমূল্যায়িত মনে করেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি একটি ভয়ংকর সমস্যা। সহকর্মী বা উর্ধ্বতন কারও আচরণ অনেক সময় নারীদের অস্বস্তিতে ফেলে। অনেকে ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না। অভিযোগ করলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না বা উল্টো হয়রানির শিকার হন। ফলে তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ না হলে নারীর কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়।

অনেক প্রতিষ্ঠানেই নিয়ম অনুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয় না। কোথাও আবার নারী কর্মীদের সন্তান নিলে চাকরি হারানোর ভয় দেখানো হয়। গর্ভাবস্থায় বিশেষ যত্ন বা সহানুভূতির অভাবও দেখা যায়। এই অবস্থা নারীদের জন্য চরম অবমাননাকর। এতে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কমে যায়। কাজ ও পরিবার ব্যালেন্স করাও কঠিন হয়ে পড়ে। নারীদের অনেক সময় অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নারীকে ঘরে গিয়েও কাজ সামলাতে হয়। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিক চাপে পড়েন। পুরুষদের মত অতিরিক্ত সময় অফিসে থাকা তাদের জন্য কঠিন। এতে তাদের উপর কাজের চাপ বেড়ে যায়। অফিস-বাসা দুই জায়গায়ই ভারসাম্য রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

কনভারশন ডিসঅর্ডার-মানসিক চাপের শারীরিক প্রকাশকে কনভারশন ডিসঅর্ডার বলে। যথাযথ সামাজিক দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরশীলতার অভাবে অনেক নারীই মানসিক চাপকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে অবচেতন মনেই এ রোগটি শারীরিক উপসর্গ হিসেবে ধরা পড়ে। পোস্ট পারটাম মেন্টাল ডিসঅর্ডার-বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পর অনেক মায়েদের মাঝে এ সমস্যাটি দেখা দেয়, এর জন্য হরমোনাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিন না ঘুমিয়ে থাকা, শারীরিক পরিবর্তন, এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সহযোগিতার অভাবে নারীদের মাঝে বিষণ্ণতা এমনকি গুরুতর মানসিক সমস্যাও হতে পারে। সোম্যাটো ফর্ম ডিসঅর্ডার-যাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে কোনো মানসিক চাপ অমীমাংসিত অবস্থায় থেকে যায়, শারীরিক উপসর্গ যেমন-মাথাব্যথা, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা কারও কারও শারীরিক প্রকাশ যতটুকু হওয়ার কথা তার থেকেও তীব্রভাবে দেখা যায়। পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এ ক্ষেত্রে মানসিক চাপ দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য মানসিক চাপ থেকে আলাদা। যেমন-বড়ো ধরনের জলোচ্ছাস, অগ্নিকাণ্ড, সিডর, ভূমিকম্প বা একজন নারী যদি অ্যাসিড বার্ন বা যৌন হয়রানির শিকার হন তাহলে সে ক্ষেত্রে পোস্টট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার দেখা যায়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘরের প্রায় সব কাজের দায়িত্বই থাকে নারীর কাঁধে। সম্প্রতি এই ধারায় খানিকটা পরিবর্তন এসেছে। তবে তা সামগ্রিক অর্থে নয়। সব ঘরে তো নয়-ই। ফলে সারা দিন অফিসে কাজ করার পর রাতে বাড়িতে এসে আবারও ঘরের কাজে কোমর বেঁধে নামতে হয় নারীদের। এ কারণে নিজের মনের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে কম। নারীদের কেবল ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবলেই চলে না। তাঁদের ওপর থাকে সমাজের নানা প্রত্যাশা। নারীদের নানারকম পারিবারিক দায়িত্বও সামলাতে হয়। নিজের ও স্বামীর পরিবারের খুঁটিনাটি বিষয়ে রাখতে হয় নজর। সন্তানের দেখাশোনা তো বটেই, তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টাও মূলত তাঁদের ঘাড়েই থাকে। সে কারণে ছুটি নিতে গিয়েও অনেক সময় পোহাতে হয় ঝঙ্কি।

কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের ধারণা এখনো সীমিত। ইদানীংকালে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ সচেতন হয়েছে। নারীর পেশা গ্রহণের ফলে সকলের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় ধীরে ধীরে নারী-পুরুষ সকলে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অধিক সচেতন হতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের জন্য ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। বিশেষ করে যেসব নারী কর্মজীবনের পাশাপাশি মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বা পরিবারের কোনো অসুস্থ সদস্যের দেখাশোনা করেন, তাদের জন্য এই চাপ আরও বেড়ে যায়। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও কিছু সহজ অভ্যাসের মাধ্যমে এই ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব।

কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য আনার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো একটি নির্দিষ্ট রুটিন মেনে চলা। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন কাজ কখন হবে, তার একটি পরিকল্পনা থাকলে সময় ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়ে যায়। রুটিন অনুসরণ করলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মতো শেষ করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে নিজের জন্যও কিছুটা সময় বের করা যায়। প্রতিদিনের কাজগুলোকে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে অপ্রয়োজনীয় চাপও কমে যায়। মনে রাখতে হবে একটি সুশৃঙ্খল রুটিন শুধু কাজের গতি বাড়ায় না, মানসিক স্বস্তিও এনে দেয়। সুস্থ শরীর ও ইতিবাচক মনোভাবের জন্য শারীরিক কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালে ১৫ থেকে ২০ মিনিট আগে ঘুম থেকে উঠে কিছুটা সময় হাঁটা, হালকা ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং করলে সারাদিনের জন্য শরীর ও মন প্রস্তুত হয়ে যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্লান্তি দূর করে। অনেক নারী দীর্ঘ সময় একটানা কাজ করতে করতে নিজের শরীর ও মনের প্রতি যত্ন নেওয়ার কথা ভুলে যান। বিশেষ করে যারা বাড়ি থেকে কাজ করেন, তারা অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকেন। এমন অভ্যাস শরীর ও চোখের জন্য ক্ষতিকর। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নেওয়া প্রয়োজন। ঘরের বাইরে গিয়ে কিছুটা হাঁটা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখা বা সূর্যের আলো উপভোগ করা মনকে সতেজ করে। এমনকি কয়েক মিনিটের বিরতিও কর্মক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কাজের চাপে অনেকেই খাবারের সময় পিছিয়ে দেন বা কখনো কখনো খাবারই বাদ দেন। কিন্তু এটি দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। শরীর সুস্থ রাখতে নিয়মিত ও সুষম খাদ্য গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

কর্মজীবন ও পারিবারিক দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানো সহজ নয়। সব দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করার চেয়ে নিজের সুস্থতা ও মানসিক শান্তি বজায় রাখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনই কর্মক্ষেত্র ও পরিবারে সফল এবং সুখী থাকতে সাহায্য করবে।

#

লেখকঃ সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার